OPEN ACCESS **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 180 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 180 - 186
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

সমরেশ বসুর কলমে মনস্বিনী কুন্তী

ড. ইন্দ্রাণী হাজরা
সহকারী অধ্যাপক
কবি জগদ্রাম রায় গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ
মেজিয়া, বাঁকুড়া
Email ID : indranihazra86@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
Samaresh Basu, Pritha, Kunti, Mahabharata, ancient era, women in society, feminist perspective.

Abstract
Samaresh Basu wrote a number of books based on Puran-Mahabharata under the pseudonym Bhramar and Kalkoot. Such as, 'Shamba (1978)', 'Juddher Sesh Senapati (1984)', 'Prachetas (1984)', 'Pritha (1986)', 'Antim Pranay (1987)' etc. 'Pritha' was published in the magazine 'Prasad' under the pseudonym 'Bhramar'. In such books, the author analyzed the traditional story of the Puranas in a new perspective.

One of the memorable Panchakanyas in Puranas, Empress Kunti has been recreated in the light of the author's spirit in this book. In the present article we will discuss how the character of Kunti has been recreated by Samaresh Basu in 'Pritha'.

At the beginning of the story, before reaching the context of Kunti, the author undertakes a very realistic analysis of heaven-hell, Gods-demons, Samhita era-Puranic era, male-female relationship, marriage customs, child birth and the position of women in society. Then he explained the solitude, self-immolation and transition of Kunti from a feminist perspective.

The story of love-marriage-motherhood-heroism-restraint-pain-sacrifice of this remarkable female character of Mahabharata has been captured in a new way in the unique writing of Kalkoot. Inventing many thoughtful arguments the author tried to establish the father-son relationship between Yudhisthira-Vidura and Karna-Durbasha. How the author incarnated new contexts in the familiar story of Mahabharata and how he made it acceptable by arranging relevant arguments in favour of his new thoughts – this essay will try to elaborate these points.

Discussion

হিমালয়ের মতো সুবিশাল আর মহাসমুদ্রের মতো সুগভীর ও অতলস্পর্শী মহাভারতের উদাত্ত গাম্ভীর্যে যুগে যুগে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়েছে পাঠক। সেই মুগ্ধতা থেকে প্রাণিত হয়েছে সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বা নবনির্মাণে। আমাদের প্রাচীনকালের এই গৌরবগাথা ও ইতিহাসটি ইতিহাসবিদ-সাহিত্যিক-গবেষকদের আলোচনার মুখ্য আধার হয়ে উঠেছে। যুগের পর যুগ ধরে অজস্র গ্রন্থ রচিত হয়ে চলেছে এই মহাগ্রন্থখানিকে অবলম্বন করে। বিভিন্ন সময়ে মহাভারতের রসবেত্তাদের অভিনব

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 180 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্যাখ্যা ও বিনির্মাণে এই গ্রন্থের আগ্রহী পাঠক সমাজের কাছে দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। নব নব রূপে উদ্ভাসিত হয়ে, বহুবিধ বৈচিত্র্যসহ এই পুরাতন ও চিরন্তন কাহিনি উপস্থিত হয়েছে পাঠকের দরবারে। পাঠকের চিন্তনশক্তিকে করেছে উজ্জীবিত।

বিশ শতকে পুরাণ-মহাকাব্য আশ্রয়ী সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন যে লেখকরা, সমরেশ বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ভ্রমর ছদ্মনামে তিনি প্রথমদিকে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা পরবর্তীকালে কালকূট ছদ্মনামে লেখা রচনাগুলির মধ্যে স্থান পায়। 'যুদ্ধের শেষ সেনাপতি (১৯৮৪)', 'পৃথা (১৯৮৬)', 'অন্তিম প্রণয় (১৯৮৭)' প্রভৃতি পুরাণাশ্রিত রচনাগুলি 'ভ্রমর' ছদ্মনামে 'প্রসাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যদিও 'শাম্ব (১৯৭৮)', 'প্রাচেতস (১৯৮৪)' প্রভৃতি সমধর্মী রচনাগুলি তিনি কালকূট ছদ্মনামেই লেখেন। এই জাতীয় গ্রন্থগুলিতে লেখক পুরাণের প্রচলিত কাহিনিকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। পুরাণে প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যার মধ্যে অন্যতমা, সম্রাজ্ঞী কুন্তী লেখকের চেতনার আলোকে কীভাবে নবরূপে নির্মিত হয়েছেন, তাই বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর 'পৃথা' (১৯৮৬) উপন্যাস অবলম্বনে আমরা আলোচনা করব। কীভাবে লেখক এই কাহিনিতে মহাকাব্যের ঐশ্বর্যময়ী এই রমণীর জীবন পরিক্রমার মধ্য দিয়ে তাঁর নিঃসঙ্গতা, আত্মদহন ও উত্তরণের গল্প শুনিয়েছেন, পরিচিত কাহিনিতে কোন নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, কীভাবে তাঁর প্রেম-দাম্পত্য-মাতৃত্ব-বীরত্ব-সংযম-যন্ত্রণা-আত্মত্যাগের কাহিনি কালকূটের অনন্য লেখনীতে নতুন ভাবে ধরা পড়েছে, তাই এখানে আমাদের বিশ্লেষণের বিষয়।

কালকূটের রচনার আঙ্গিক আলোচনা প্রসঙ্গে প্রসূন ঘোষ বলেন, -

> "যদিও রিপোর্টাজ লেখার অভিপ্রায়েই কালকূট কলম ধরেছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনা রিপোর্টাজ নয়, ভ্রমণকাহিনী নয়, উপন্যাস।"[১]

তাঁর মতে, কাহিনিতে আপাত শিথিলতা, আঙ্গিকে আপাত অমনোযোগের ছাপ থাকলেও "তার মধ্যে পরিপূর্ণতা আছে, বিন্যাসে সামগ্রিকতা আছে, তা কখনও অসম্পূর্ণ মনে হয় না।"[২] আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। কালকূটের অন্যান্য রচনার মতো এখানেও আত্মকথনরীতি ব্যবহৃত হয়েছে। মননশীল প্রাবন্ধিকের মতো পুরাণ-ইতিহাসকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেছেন লেখক। যথার্থ ভ্রামণিকের মতো পুরাণের পথ পরিক্রমার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই উপন্যাসের প্রচলিত মাপকাঠি থেকে একটু ভিন্ন গোত্রীয় বলে আলোচকদের মধ্যে কালকূটের রচনাগুলি নিয়ে মতের ভিন্নতা লক্ষিত হয়।

জাতীয় পুরাণ থেকে উপাদান নিয়ে যে গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছে, তাতে অলৌকিকতা বাদ দিয়ে ঘটনাবলির যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যায় ব্রতী হয়েছেন লেখক। চিরাচরিত বা গতানুগতিক ব্যাখ্যা বা যুক্তিকে সব জায়গায় তিনি গ্রহণ করেননি।

> "মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রয়োজনানুগ সামঞ্জস্য বজায় রেখে কালকূট নির্দিষ্ট ঘটনার উপর সম্পূর্ণ নিজস্ব মতামত আরোপ করেছেন। ইতিবৃত্তীয় ঘটনাবলীর বিশ্লেষণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার যে সূক্ষ্ম আভাস কালকূট তাঁর এই পর্যায়ের রচনাগুলিতে সংযোজন করেছেন, তা এতাবৎকালের পুরাণচর্চার আলোকে এক নতুন অবদান বলেই স্বীকার করতে হবে।"[৩]

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে আখ্যানের শুরুতে কুন্তীর প্রসঙ্গে পৌঁছানোর পূর্বে স্বর্গ-নরক, দেবতা-অসুর, সংহিতা যুগ-পৌরাণিক যুগ, সেই সময়ের নর-নারী সম্পর্ক, শাস্ত্রীয় বিধান, বিবাহ প্রথা, সন্তানের জন্ম ও নারীর অবস্থান সম্পর্কে লেখকের অতীব বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই অংশে মনোজ্ঞ প্রাবন্ধিকের মতো তর্কসহকারে পুরাণ-ইতিহাসের পরিচিত ঘটনাবলির মধ্যে অন্তর্নিহিত বাস্তব সত্যকে অন্বেষণে রত হয়েছেন লেখক। নিজের চিন্তার স্বপক্ষে অভিনব যুক্তিজাল বিন্যস্ত করে তাকে কীভাবে গ্রহণযোগ্যভাবে উপস্থাপন করেছেন, তাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে লেখক বলেন, -

> "ইতিহাসের এ সকল পাতাগুলো দেখতে হচ্ছে, কারণ, সমস্ত অলৌকিক অবাস্তব ব্যাপারগুলো যেন আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে না পারে। আমার চিন্তাকে জ্ঞানের বাইরে নিয়ে গিয়ে, সত্য দর্শনে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।"[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 180 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ মহাকাব্যের একজন কৌতূহলী রসভোক্তা হিসেবে তাতে অন্তর্লীন গভীর কোনো সত্য ছিল লেখকের অন্বিষ্ট। তাই তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ ইতিহাসের চেয়ে ধর্মকে বেশি মান্যতা দেয় বলেই হয়তো আমাদের প্রাচীন ইতিহাসকে রক্ষা করার জন্য ধর্মগ্রন্থের অলৌকিকতা ও অবাস্তবতার আবরণ ব্যবহার করা হয়েছে। স্বর্গ ও নরক যে আমাদের পৃথিবীর মধ্যেই অবস্থিত, দেবতা ও অসুর যে আসলে বিশেষ বিশেষ শ্রেণির মানুষ – এসব কথা বিশেষভাবে যুক্তিসহ উল্লেখ করেন তিনি। অমোঘ, অপ্রতিহত কালকে যে কেউ অতিক্রম করতে পারে না – মহাকবির এই প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক সত্যের আলোয় তিনি নতুন এক সত্যকে আবিষ্কার করেন। সংহিতা যুগ ও তারপরের পৌরাণিক যুগের অনুশাসন ও সামাজিক রীতি-নীতির বিবর্তনগুলি সূক্ষ্মভাবে তাঁর পর্যালোচনায় উঠে আসে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সেকালে প্রচলিত আট রকম বিবাহ ও দ্বাদশ প্রকার পুত্রোৎপাদন পদ্ধতির উল্লেখ প্রসঙ্গে নারী-স্বাধীনতা ও নারীর সামাজিক অবস্থানটি তিনি পাঠকের কাছে তুলে ধরেন। সংহিতা যুগের মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্বাধীন যৌনাচার যে সমাজ স্বীকৃত ছিল, দৈহিক শুচিতাই যে তার শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক গুণ বলে বিবেচিত হত না তা তিনি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তারপর ক্রমশ সংহিতা যুগের শেষ থেকেই ঋষি উদ্দালক, শ্বেতকেতু ও দীর্ঘতমার প্রসঙ্গ এনে কেমনভাবে নারীর দৈহিক শুচিতার উপর গুরুত্ব আরোপ শুরু হচ্ছে ও তার যৌন স্বাধীনতা খর্ব করা হচ্ছে সে আলোচনা করেন। এরপর অনেকখানি অংশ জুড়ে পৌরাণিক (সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি) যুগের যথার্থ সময়কাল সম্পর্কিত বিভিন্ন জিজ্ঞাসা উত্থাপন করে তার উত্তর সন্ধানের মধ্য দিয়ে পাঠকের হৃদয়ে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলেন। এই অংশেই মহাভারতের বিভিন্ন দৃষ্টান্তসহ কানীন পুত্র বা ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম সম্পর্কিত শাস্ত্রীয় বিধান কোন সময়ের সমাজ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, সেই প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা করেন।

সরাসরি কুন্তীর জীবনকাহিনির মধ্যে প্রবেশের পূর্বে তাঁর এই সুদীর্ঘ যুগ পরিক্রমার হেতু তিনি নিজেই উল্লেখ করেন, -

> "সামাজিক মূল্যায়ন ব্যতীত, পৃথা, তথা কুন্তীর জীবনের, সমস্ত ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে বোঝা সম্ভব না।"[৫]

পুরাণের নায়ক বা নায়িকা তাঁর কাহিনির বিষয় হলেও তাঁদের তিনি সমস্ত রকম অযৌক্তিকতা ও অলৌকিকতা ব্যতিরেকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসবেই গ্রহণ করেছেন। পৃথার জীবন ইতিহাসকে সবদিক দিয়ে বাস্তব বলে গ্রহণযোগ্য করে তোলাই যে তাঁর এই রচনার উদ্দেশ্য তা কাহিনিতে বারবার উচ্চারণ করেছেন। গ্রন্থের শুরুতে লেখককে বলতে দেখা যায়, -

> "রানী বা মহারানী থাক। যাঁকে দর্শন করতে আমার এবারের যাত্রা, তাঁকে আপাততঃ আমি রমণী বলেই উল্লেখ করবো। যে রমণীকে ঘিরে, বহুকাল ধরে মানুষের নানা প্রশ্ন, নানা উক্তি, নানা মন্তব্য, যে-সবের মধ্যে আসল রমণীটি হারিয়ে গিয়েছেন।"[৬]

বোঝা যায়, সম্রাজ্ঞীর ঐশ্বর্যময় রূপের আড়ালে পৃথার সাধারণ রমণীসত্তার প্রাপ্তি ও ব্যর্থতার গল্প শোনাতে আগ্রহী রচয়িতা। যাঁর বাস্তব সত্তার উপর বহুতর কল্পিত ও অলৌকিক সব আবরণ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, সেই কুহেলিকা ছিন্ন করে তাঁর সাধারণ মানবী সত্তার অবয়ব নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন কাহিনিকার।

মহাভারতের কাহিনির মধ্যে কুন্তীর যে জীবনালেখ্য নির্মিত হয়েছে তার পরিচয় নিলে দেখা যায়, যদুবংশীয় শূরসেন তাঁর পরমাসুন্দরী পুত্রী পৃথাকে নিঃসন্তান রাজা কুন্তিভোজকে দান করেন। কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা বলেই পৃথার নাম হয় কুন্তী। তারপর পালক পিতার আদেশে অতিথি দুর্বাসা ঋষির সেবা, ঋষির বরদান, কানীন পুত্রলাভ ও লোকলজ্জার ভয়ে তাকে পরিত্যাগের কাহিনি বর্ণিত। এরপর স্বয়ম্বর সভায় পাণ্ডুকে মাল্যদান, মাদ্রীর সঙ্গে পাণ্ডুর দ্বিতীয় বিবাহ, দুই পত্নী নিয়ে বনবাস যাত্রা – এই পথে কুন্তীর জীবন এগিয়ে গেছে। বনবাসকালে স্বামীর অনুরোধে বংশ রক্ষার জন্য কুন্তীকে দেবতাদের ঔরসে তিন পুত্রের জন্ম দিতে হয়েছে। এরপর পাণ্ডুর মৃত্যু, মাদ্রীর সহমরণ, পাঁচ পুত্র নিয়ে কুন্তীর হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন, জতুগৃহ পর্বে বিদুরের জন্য প্রাণরক্ষার প্রসঙ্গ বর্ণিত। পর্যায়ক্রমে পাণ্ডবদের দ্রৌপদী লাভ, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজত্ব,

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 25
Website: https://tirj.org.in, Page No. 180 - 186
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কপট পাশাখেলায় সর্বস্ব হারিয়ে পাণ্ডবদের বধূসহ বনবাসযাত্রা ও বিদুরের অন্তঃপুরে কুন্তীর অবস্থানের কথা এসেছে। তারপর যুদ্ধের জন্য পুত্রদের উদ্‌বুদ্ধ করা, কর্ণের কাছে যাওয়া, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, কর্ণের মৃত্যু, পূর্বজদের পিণ্ডদানের সময় পুত্রদের কাছে সত্য উন্মোচন ও মাতৃহৃদয়ের হাহাকারের ছবি। এরপরের পনেরো বছর ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সেবা ও শেষে তাঁদের সঙ্গে বাণপ্রস্থ যাত্রা, আশ্রম জীবনকালে ব্যাসদেবের যোগবলে হারানো পুত্র পরিজনদের প্রত্যক্ষ করার আনন্দ এবং যোগাবস্থায় দাবানলে আত্মাহুতির কাহিনি। এই জীবন বৃত্তান্তে মনস্বিনী কুন্তীর জীবনের যে নিঃসঙ্গতা ও আত্মদহনের ছবি ফুটে উঠেছে, তাকে আপন প্রতিভার স্বকীয়তায় নতুন ভাষ্যরূপ দান করেছেন সমরেশ বসু। এই প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন,

> "সব মিলিয়ে মহাভারতের এই চরিত্রের এ হেন নারীবাদী পাঠ আর কেউ করেছেন বলে জানা নেই।"[৭]

তাই পরবর্তী অংশে পুরাণের এই চিরন্তনী নারী চরিত্র লেখকের হাতে কীভাবে ভিন্নরূপে নির্মিত হল, সে আলোচনায় আমরা অগ্রসর হব।

'মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া' গ্রন্থে চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত বলেন, মিথের প্রত্নপ্রতিমার অবস্থান-স্তর হল context; তার উপর গড়ে ওঠা কাহিনির অবস্থান-স্তর হল Text (উপজীব্য); আর সেই কাহিনিকে ভেঙে গড়ে যখন নতুন কাহিনি সৃষ্টি করা হয়, তখন সেটি Texture (বিন্যাস) স্তরের অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন মিথ নিয়ে নতুন সৃষ্টির পথে স্রষ্টা অতীতকে বোঝা এবং বোঝানোর জন্য নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নেন।

> "এই নতুন ব্যাখ্যা সম্বলিত হয়ে প্রাচীন মিথ-কাহিনির যে নবরূপায়ন হয় তার অন্তর্নিহিত অর্থ এবং বহির্বিন্যাসের বক্তব্য– দুই-ই মূল মিথের ভাষ্যকে অতিক্রম করে যায়- কখনও সমসাময়িক প্রেক্ষিতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, কখনো বা ব্যক্তিগত বোধির সঙ্গে মানানসই করে গড়ে ওঠে এই নতুন পুনর্নিমিত চেহারাটি।"[৮]

'পৃথা' উপন্যাসে পৃথার শৈশব, কৈশোর, দাম্পত্য, মাতৃত্বকেও সেযুগের সামাজিক পরিমণ্ডলে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে পুনর্মূল্যায়ন করেছেন লেখক। এখানে মহাভারতের কাহিনি বা চরিত্রের নবরূপায়নের মাধ্যমে অন্তর্নিহিত অর্থ ও বহির্বিন্যাসের বক্তব্য অনেক সময়ই যে মূল কাহিনির ভাষ্যকে অতিক্রম করে গেছে, তা স্পষ্ট অনুভূত হয়।

মহাকাব্যে কুন্তী কৃষ্ণের কাছে তাঁর শৈশবে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চনা ও শ্বশুরকুলে পাওয়া লাঞ্ছনার কথা বলেন। আলোচ্য গ্রন্থে দেখি লেখক শিশু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ঘটনাটি বিশ্লেষণ করেন। শৈশবে পিতামাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনাটিই যে দুঃখিনী মেয়েটির জটিল ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অনন্যতার অন্যতম কারণ সেকথা বলেন। মহাভারতের বিদগ্ধ গবেষক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীও এই প্রসঙ্গে দত্তক সন্তানের মানসিক জটিলতার দিকটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

তারপর লেখক পালক পিতার গৃহে আতিথ্য নেওয়া ঋষি দুর্বাসাকে সেবায় তুষ্ট করে কুন্তীর বরলাভ প্রসঙ্গে এসে প্রচলিত কাহিনিকে ভেঙে নতুন ভাষ্য নির্মাণ করেন। দুর্বাসার বরে সূর্যকে আহ্বান করার তত্ত্ব বাদ দিয়ে তিনি বিভিন্ন সংকেত দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, আসলে কুন্তীর কানীন পুত্রের পিতা ছিলেন সূর্যসদৃশ তেজবহ্নিসম্পন্ন সুপুরুষ ঋষি দুর্বাসা। প্রথমাবধি যিনি অলৌকিকতা বর্জন করে কাহিনির বাস্তবরস সন্ধানে ব্যাপৃত, সেই লেখক একাধিকবার যুক্তিসহকারে মন্তব্য করেন যে, নরনারীর মিলন ভিন্ন কোনো জাতির পক্ষেই সন্তান জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়। তাই দেবতাকে আহ্বান করা বা নাভিস্পর্শের মাধ্যমে কুন্তীকে গর্ভবতী করার কাহিনি গ্রহণ না করে তিনি এক নতুন ব্যাখ্যা দেন।

> "মিথকে এমনভাবে ভাঙার মাধ্যমে তার অন্তর্বিলীন হয়ে থাকা সম্ভাব্যতা এবং যুক্তিগ্রাহ্য উন্মোচন ঘটেছে সন্দেহ নেই। কর্ণ-কুন্তী মিথের প্রেক্ষিতে কালকূটের এই রূপান্তরণ ঘটানো অবশ্যই এক ধরনের নতুন মাত্রাবিন্যাস ঘটিয়েছে যে, সেকথা বলাই বাহুল্য।"[৯]

এরপর অনেকগুলি ঘটনা পরম্পরা বিচার করে, অধিরথ-ধৃতরাষ্ট্র-কুন্তিভোজের সংযোগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কুন্তী যে অনুচরদের সাহায্যে প্রিয় সদ্যোজাত সন্তানকে সুরক্ষিতভাবে নিঃসন্তান দম্পতির কাছে পাঠিয়ে দেন ও গোপনে তার সমস্ত সংবাদ রাখতে থাকেন, এই কথা জানান। অবিস্মরণীয়া ব্যক্তিত্বময়ী এই নারীর অসীম বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার পরিচয় তুলে ধরেন লেখক এইভাবে। আর যেভাবে নিজ মন্তব্যের স্বপক্ষে সুচারুভাবে অকাট্য যুক্তিজাল বিন্যস্ত করেন, তা পাঠককে চমকিত করে। বিবাহের পর স্বামীসুখলাভে বঞ্চিতা কুন্তীর মানসিক যন্ত্রণার উপর পৃথকভাবে আলোকপাত করেন লেখক। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সপত্নীর আগমন, দুই যুবতী পত্নীকে প্রাসাদে রেখে পাণ্ডুর দিগ্বিজয়ে যাত্রা, ফিরে এসে পত্নীদের নিয়ে বনাগমন –এই ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে অসামান্যা সুন্দরী পৃথার ব্যর্থ যৌবনের হাহাকার ও বিষণ্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করেন লেখক। আবারও কিমদ্দক মুনির অভিশাপের অবাস্তব ঘটনার অন্তরালে পাণ্ডুর সহবাসে অক্ষমতার কথা তুলে ধরেন। তার পিছনে কারণ হিসেবে বলেন, অপরিসীম ভোগে মত্ত বিচিত্রবীর্যের কোনো যৌন ব্যাধি তার রানিদের মাধ্যমে হয়তো সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, যাতে নারী সংসর্গে লিপ্ত হলেই পাণ্ডুর মৃত্যু অবধারিত হয়ে উঠেছিল।

এরপরের অংশে কুন্তীর জীবনের আর এক বেদনাদায়ক অধ্যায়ের কথা তুলে ধরেন লেখক, তা হল স্বামী বর্তমানে তাঁর বংশরক্ষার জন্য অন্য পুরুষের সন্তানধারণের বেদনা। পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী ধর্মকে আহ্বান করেছিলেন, একথা মহাভারতে বলা হলেও এই ধর্ম যে আসলে দাসীপুত্র বিদুর, এবং যুধিষ্ঠির বিদুরের ঔরসজাত সন্তান– একথা নির্দেশ করেন কালকূট। এইখানে আবার পুরাণের কাহিনিকে ভেঙে নতুন রূপ দান করেন লেখক। ইরাবতী কার্ভে, প্রতিভা বসু বা বাণী বসুর ভাবনায় এই একই ইঙ্গিত মিললেও বুদ্ধদেব বসু বা নৃসিংহপ্রাসাদ ভাদুড়ীর ভাবনায় বিপরীত মতের প্রতিফলন লক্ষিত হয়। কিন্তু 'পৃথা' উপন্যাসে এই ভাবনাকে সুদৃঢ় করার জন্য সমরেশ বসু যে প্রখর যুক্তির অবতারণা করেন, তা অভিনব।

প্রথমাবধি বিদুরের প্রতি পৃথার বিশেষ নির্ভরতা এবং সমগ্র কাহিনি জুড়ে যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিদুরের বিশেষ স্নেহাধিক্যের ঘটনাগুলি ধারাবাহিকভাবে স্মরণ করেন লেখক, আর অন্তিমকালে যুধিষ্ঠিরের দেহে বিদুরের লীন হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে বিশ্লেষণ করেন স্বকীয় ধরণে, -

> "এখানে ধর্মে ধর্ম লীন হয়েছে বটে। আমি দেখছি, পিতা পুত্রের দেহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করলেন।"[১০]

এরপরের অংশে আবারও নরনারীর দৈহিক মিলনকে সন্তান উৎপাদনের একমাত্র পন্থা বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং যুধিষ্ঠির-ভীম-অর্জুনের বয়সের দূরত্বের হিসাব কষে তিনি পাঠককে আবারও এক নতুন সম্ভাব্যতার দিকে নিয়ে যান। কুন্তী যেহেতু ইতিপূর্বে অজ্ঞাত পুরুষের সঙ্গে সহবাস করেননি, যেহেতু বিদুর ও দুর্বাসার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তাই শতশৃঙ্গ পর্বতে বাসকালে সেখানকার গুণিশ্রেষ্ঠ ঋষিগণের দ্বারাই যে তিনি আরও দুই ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম দেন – একথা উল্লেখ করেন। এইভাবে কুন্তীকে কেন্দ্র করে গ্রন্থটিতে তীব্র তীক্ষ্ণ যুক্তির বিন্যাসে পরতে পরতে নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটান কালকূট।

তেজস্বিনী ক্ষত্রিয় রমণী কুন্তীর চরিত্রে সুগভীর বুদ্ধিমত্তা, অসীম দুরদর্শিতা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যবোধ, বীরত্ব ও সংযমের অপূর্ব সংমিশ্রণ লক্ষ করেছেন লেখক। পুত্রদের দ্রৌপদীকে ভাগ করে নিতে আদেশ দেওয়া অথবা রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষ্ণের মাধ্যমে পুত্রদের বিদুলা-সঞ্জয়ের কাহিনি শুনিয়ে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করা – সবেতেই তার প্রমাণ তুলে ধরেছেন। একচক্রা নগরীতে ব্রাহ্মণ পরিবারকে বক রাক্ষসের থেকে রক্ষার জন্য স্বীয় পুত্রকে বিপদের সামনে পাঠাতে দ্বিধা না করা অথবা বনবাসের প্রাক্কালে মাদ্রীপুত্র সহদেবের খেয়াল রাখার জন্য দ্রৌপদীকে অনুনয় করা – এসবই তাঁর চরিত্রকে অত্যুজ্জ্বল মহিমা দান করেছে বলে দেখিয়েছেন লেখক।

আজন্মকাল সুখভোগে বঞ্চিতা এই মহীয়সী নারী জীবনব্যাপী কন্যা স্ত্রী ও মাতারূপে কর্তব্যপালনের মাধ্যমে ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ হয়ে ওঠেন। পুরুষশাসিত সমাজ ও তার অনুশাসন কীভাবে বাল্যাবধি তাঁর এই অপ্রাপ্তির প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে দেয়, তা এই গ্রন্থে রচয়িতার নিখুঁত পর্যবেক্ষণে উঠে আসে। যে সদ্যোজাত কানীন পুত্রকে পরিত্যাগের যন্ত্রণা তাঁকে আমরণ দগ্ধ করে, যে সন্তানকে গোপনে জন্ম দেওয়ায় অন্তরে নিজেকে স্বৈরিণী ভেবে গ্লানিবিদ্ধ হন – সে সবেরই

পিছনে যে পুরুষতান্ত্রিক যুগের পরিবর্তিত সংস্কার ও বিধান দায়ী ছিল তা দেখান লেখক। তাই কাহিনিতে সামাজিক মূল্যায়নকে এতখানি গুরুত্ব দেন তিনি। যে ভীষ্ম বেদব্যাসকে কানীন পুত্র জেনেও কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, সেই ভীষ্মকেই দেখি শরশয্যা থেকে কর্ণকে 'ধর্মলোপে জন্ম' বলে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে। তাই প্রায় একশো বছরের ব্যবধানে সমাজে কানীন পুত্র সম্পর্কিত সংস্কারে কতখানি বিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তা অনুমান করেন লেখক।

এইভাবে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতা নিজের সুবিধার্থে কীভাবে ক্রমশঃ নারীর স্বাধীন যৌনাচারে বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল, তা সময়কাল ধরে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেন লেখক। অতি ক্রুর স্বভাবাপন্ন নরনারীকেও কোনোক্রমে দৈহিক শুচিতা রক্ষা করতে পারলেই সৎ চরিত্র বলে গণ্য করার যে প্রথা– তাকে প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখে দাঁড় করান লেখক। সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে, মহাভারতের আদিমতম অংশ থেকে শেষতম অংশের ব্যবধান অন্তত আটশো বছরের। এই দীর্ঘকাল সমাজের বিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী, ফলে মহাভারতেও সেই পরিবর্তন প্রতিফলিত। তাঁর মতে আদি ক্ষত্রিয় কাহিনি রচনার পরে কিছু নৈতিক কাহিনি মহাভারতে সংযোজিত হয়।

> "শেষতম অর্থাৎ দ্বিতীয় সংযোজনের কর্তা ভৃগুবংশীয় ঋষিরা, এটি ব্রাহ্মণ্য সংযোজন বলে খ্যাত। নারী ও শূদ্রের অবনমনের স্পষ্টতম চিত্র এই অংশে।"[১১]

'পৃথা' গ্রন্থের স্রষ্টাও নারীর সেই সামাজিক ক্রম-অবনমনের চিত্রকে তুলে ধরেন তাঁর বয়ানে। ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'মহাভারতের নারী' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রাচীন মুনিঋষিদের প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, -

> "যাঁদের পুরুষের অত্যাচার সইতে হয়েছিল কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল ছিলেন।"[১২]

আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে সেই পঞ্চকন্যার অন্যতমা পুণ্যবতী কুন্তী তাঁর সকল দুঃখ-দহনসহ সমরেশ বসুর কলমে স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর হয়ে ওঠেন।

সদ্যোজাত সন্তানকে স্বীকৃতি দিতে না পারার যে অপরাধবোধ কুন্তীকে তিলে তিলে যন্ত্রণায় দগ্ধ করে, সেই অপরাধবোধই তাঁকে সুখৈশ্বর্যভোগে বীতস্পৃহ করে রাখে আজীবন। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বিজয়ী পুত্রদের গর্বিতা মাতা হিসেবে না, বিষাদময়ী পাষাণপ্রতিমা কুন্তী এক হয়ে যান সর্বস্বহারা কুরুকুলবধূদের সঙ্গে। সলিলাঞ্জলির সময় বুকফাটা হাহাকারে স্বর্গগত প্রথম পুত্রের জন্য শ্রদ্ধা নিবেদনের অনুরোধ জানান পাণ্ডবদের। আজীবন অন্তরে লালন করা বৈরাগ্য নিয়ে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর সঙ্গে বাণপ্রস্থ যাত্রা করেন। তবু, সেই প্রথম যৌবনের কৃতাপরাধের ভার তাঁকে মুক্তি দেয় না। অবশেষে আশ্রমজীবনে বেদব্যাসকে তাঁর যোগবলে কর্ণকে দেখার বাসনা জানিয়ে সমস্ত সত্য অকপটে স্বীকার করেন ও মৃতপুত্রকে দর্শন করে শান্তি পান। বছরখানেক পরে তপোবনে যোগাসনে দাবানলে প্রাণ আহুতি দেন।

এই আত্মদহনের মধ্য দিয়ে কুন্তী চরিত্রের নিকষিত হেম হয়ে ওঠার গল্প শোনান সমরেশ বসু তাঁর 'পৃথা' গ্রন্থে। নিজস্ব বীক্ষায় অনন্যরূপে নির্মাণ করে তোলেন মহাভারতের এই গরীয়সী নারীকে। এই চরিত্র ঘিরে তাঁর যে বিমুগ্ধ সম্ভ্রম গ্রন্থের শেষাবধি প্রকাশিত হয়, পাঠককে তা পুনঃপুন প্রাণিত করে 'পৃথা'কে ফিরে দেখতে, -

> "আমি দেখছি, ইতিহাসের পাতায়, কী ঐশ্বর্যময়ী রমণী চিত্র অঙ্কিত। সারা জীবনের দুঃখের মধ্যেও যিনি ভেঙে পড়েননি, এবং যোগাসনে বসে দাবানলে প্রাণত্যাগ করছেন। পৃথার জীবন যেন সমস্ত সুখ দুঃখের ঊর্ধ্বে। যিনি প্রেম কী তা জেনেছেন। কিন্তু সারা জীবন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়েছেন। বিশেষ করে, তাঁর পাপবোধ, বিশ্বের সকল মানবীকে নতুন চেতনা দিয়েছে। পৃথা! তুমি আমাদের সকলের প্রণাম নাও।"[১৩]

Reference:

১. ঘোষ, প্রসূন, বাংলা উপন্যাসের বিবর্তন : আত্মকথনরীতির উপন্যাস, আশাদীপ, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ২২৩
২. তদেব, পৃ. ২২৩
৩. চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ, 'মানুষ কালকূট, কালকূটের মানুষ', সত্যজিৎ চৌধুরী-নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত-বিজলি সরকার (সম্পা.), সমরেশ বসু : স্মরণ-সমীক্ষণ, চয়নিকা, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৫০৯
৪. কালকূট, পৃথা, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ১১
৫. তদেব, পৃ. ২৯
৬. তদেব, পৃ. ১১
৭. বসু, শ্রীলা, 'কালকূটের ভারতবর্ষ', অভ্র ঘোষ (সম্পা.), পরিচয় পত্রিকা : শতবর্ষে সমরেশ বসু, কলকাতা, মার্চ – জুন ২০২৪, পৃ. ১০৪
৮. সেনগুপ্ত, চন্দ্রমল্লী, মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ২৩
৯. তদেব, পৃ. ১৯৯
১০. কালকূট, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
১১. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ, কলকাতা, ১৪২৯, পৃ. ১১১
১২. ভট্টাচার্য, ধীরেশচন্দ্র, মহাভারতের নারী, আনন্দ, কলকাতা, ২০২২, ভূমিকা, পৃ. ২
১৩. কালকূট, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

Bibliography:

কালকূট, পৃথা, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৯৪
ঘোষ প্রসূন, বাংলা উপন্যাসের বিবর্তন : আত্মকথনরীতির উপন্যাস, আশাদীপ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২২
চৌধুরী সত্যজিৎ-সেনগুপ্ত নিখিলেশ্বর-সরকার বিজলি (সম্পা.), সমরেশ বসু : স্মরণ-সমীক্ষণ, চয়নিকা, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
বসু বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা – ৭৩, এপ্রিল ১৯৭৪
ভট্টাচার্য ধীরেশচন্দ্র, মহাভারতের নারী, আনন্দ, কলকাতা, ২০২২
ভট্টাচার্য সুকুমারী, প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ, কলকাতা, ১৪২৯
ভট্টাচার্য সুখময়, মহাভারতের চরিতাবলী, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১২, আষাঢ় ১৩৬৪
ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়, আনন্দ, কলকাতা, ২০২২
সেনগুপ্ত চন্দ্রমল্লী, মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০২৩

পত্র-পত্রিকা

ঘোষ অভ্র (সম্পা.), পরিচয় পত্রিকা : শতবর্ষে সমরেশ বসু (বিশেষ সংখ্যা), কলকাতা, মার্চ – জুন ২০২৪, বর্ষ ৯৩, ৯-১২ সংখ্যা।